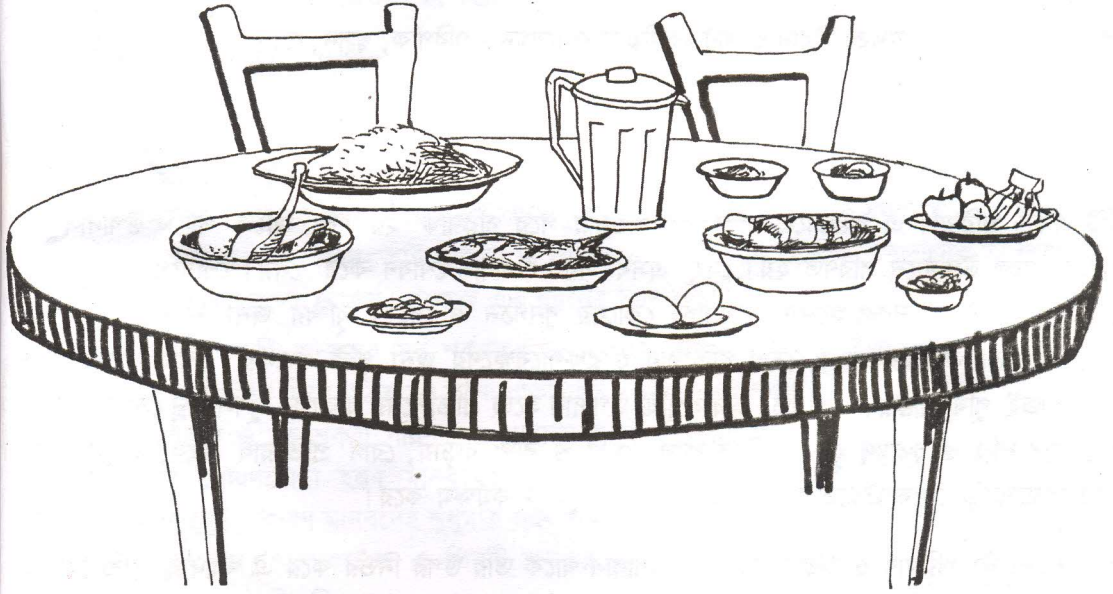


## ত্রয়োদশ অধ্যায়

### খাদ্য ও পুষ্টি

বর্তমানে পৃথিবীতে বাস করছে লাখ লাখ বিভিন্ন জাতের প্রাণী। এদের আকার-আকৃতি ও বৈশিষ্ট্য যেমন ভিন্নতর তেমন বিচিত্র এদের জীবনধারা, স্বভাব, খাদ্য ও খাদ্যগ্রহণ পদ্ধতি। দেহের বৃদ্ধি, শক্তি ও বেঁচে থাকার জন্য প্রতিটি প্রাণীর খাদ্য অপরিহার্য। অতএব মানবদেহকে সুস্থ-সবল রাখার জন্যও খাদ্য অপরিহার্য। খাদ্য ও পুষ্টি সম্পর্কে যথেষ্ট ধারণা অর্জন করা দেহকে সুস্থ রাখার পূর্বশর্ত। আমিষ, শর্করা, তেল ও চর্বি ইত্যাদি জৈবযোগ্য আমরা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করি। আর এ সকল খাদ্য থেকে পুষ্টি পাই। খাদ্য বলতে সেই সকল জৈব উপাদানকে বোঝায় যেগুলো জীবের দেহ গঠন, ক্ষয়পূরণ ও শক্তি উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। আর এ খাদ্য থেকে জীব পুষ্টি লাভ করে।



এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা—

- বিভিন্ন খাদ্যের পুষ্টিগুণ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- পুষ্টির অভাবজনিত রোগ নির্ণয় ও প্রতিরোধের উপায় বর্ণনা করতে পারব;
- চাহিদা অনুযায়ী খাদ্য নির্বাচন করতে পারব।

## পাঠ ১ : পুষ্টি, পুষ্টিমান ও খাদ্য উপাদান

ইঞ্জিন চালানোর জন্য কয়লা, ডিজেল, পেট্রোল, প্রাকৃতিক গ্যাস ইত্যাদি উপাদান ব্যবহার করা হয়। বলতে পারো, এ জ্বালানিগুলোর কাজ কী? এ জ্বালানিগুলো পুড়ে শক্তি উৎপন্ন করে। আর এ শক্তি যানবাহনগুলোকে গতি দান করে। যানবাহনগুলো চলতে থাকে। মানবদেহকে একটি ইঞ্জিনের সাথে তুলনা করা হয়। অন্যান্য ইঞ্জিনের মতো আমাদের দেহ নামক ইঞ্জিনটি চালানোর জন্য চাই শক্তি। মানবদেহ এ শক্তি কোথা থেকে পায়? খাদ্য আমাদের দেহের পুষ্টি চাহিদা পূরণ করে ও শক্তি যোগায়। খাদ্যের মূল উৎস সজীব দেহ। খাদ্য মূলত বিভিন্ন যৌগের সমন্বয়ে গঠিত। আমরা উদ্ভিদ ও প্রাণী থেকে মূলত খাদ্য পাই। খাদ্য বলতে সেই জৈব উপাদানকে বোঝায় যা জীবের দেহ গঠন ও শক্তি উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। খাদ্যের মধ্যে যে সকল উপাদান বা পুষ্টিদ্রব্য থাকে তা আমাদের দেহে প্রধানত তিনটি কাজ করে। যথা—

- জীবের বৃদ্ধি সাধন, ক্ষয়পূরণ ও রক্ষণাবেক্ষণ।
- তাপশক্তি ও কর্মশক্তি প্রদান।
- রোগ প্রতিরোধ, সুস্থতা বিধান ও শারীরবৃত্তীয় কাজ (যেমন : পরিপাক, শ্বসন, রেচন ইত্যাদি) নিয়ন্ত্রণ করে।

### পুষ্টি ও পুষ্টিমান

পুষ্টি একটি প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়াতে খাদ্যবস্তু খাওয়ার পরে পরিপাক হয় এবং জটিল খাদ্য উপাদানগুলো ভেঙে সরল উপাদানে পরিণত হয়। দেহ এসব সরল উপাদান শোষণ করে নেয়। শোষণের পরে খাদ্য উপাদানগুলো দেহের সকল অঙ্গের ক্ষয়প্রাপ্ত কোষের পুনর্গঠন ও দেহের বৃদ্ধির জন্য নতুন কোষ গঠন করে। তাছাড়া তাপ উৎপাদন, রোগ প্রতিরোধ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পুষ্টি যোগায়। দেহে খাদ্যের এই সকল কাজই পুষ্টি প্রক্রিয়ার অন্তর্গত। অর্থাৎ পুষ্টি উপাদান হচ্ছে প্রতিদিনের খাবারের গুণসম্পন্ন সেসব উপাদান যা দেহের শক্তি ও যথাযথ বৃদ্ধি নিশ্চিত করে, মেধা ও বুদ্ধি বাড়ায়, রোগ প্রতিরোধ করে, অসুখ-বিসুখ থেকে তাড়াতাড়ি সেরে উঠতে সাহায্য করে এবং মানুষকে কর্মক্ষম করে।

কোন খাদ্যে কী পরিমাণ ও কত রকম খাদ্য উপাদান থাকে তার উপর নির্ভর করে ঐ খাদ্যের পুষ্টিমান বা পুষ্টিমূল্য। যেমন— সিদ্ধ চালে ৭৯% শ্বেতসার, ৬% স্নেহ পদার্থ থাকে। এছাড়া সামান্য পরিমাণ আমিষ, ভিটামিন ও খনিজ লবণ থাকে। ১০০ গ্রাম চাল থেকে ৩৪৫-৩৪৯ কিলোক্যালরি শক্তি পাওয়া যায়। সিদ্ধ চালে শ্বেতসার, আমিষ ও ভিটামিন থাকে। কিন্তু এতে শ্বেতসারের পরিমাণ বেশি থাকে। অতএব চাল একটি শ্বেতসার জাতীয় পদার্থ।

কোনো খাদ্য উপাদানের পুষ্টিগুণ সম্পর্কে জানতে হলে ঐ খাদ্যের প্রকৃতি সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। খাদ্যের প্রকৃতি বলতে এটা কি মিশ্র খাদ্য, নাকি বিশুদ্ধ খাদ্য তাকে বোঝায়। মিশ্র খাদ্যে একের অধিক পুষ্টি উপাদান বিদ্যমান থাকে। যেমন— দুধ, ডিম, খিচুরি, পেয়ারা ইত্যাদি। অন্যদিকে বিশুদ্ধ খাদ্যে শুধুমাত্র একটি উপাদান থাকে। যেমন— চিনি, গ্লুকোজ। এতে শর্করা ছাড়া আর কোনো উপাদান থাকে না।



## খাদ্য উপাদান

খাদ্য অনেকগুলো রাসায়নিক উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত। এ রাসায়নিক উপাদানগুলোকে খাদ্য উপাদান বলা হয়। কেবলমাত্র একটি উপাদান দিয়ে গঠিত এমন খাদ্যবস্তুর সংখ্যা খুবই কম। উপাদান অনুযায়ী খাদ্যবস্তুকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা—

১. আমিষ বা প্রোটিন – ক্ষয়পূরণ, বৃদ্ধিসাধন ও দেহ গঠন করে।
২. শর্করা বা শ্বেতসার – শক্তি উৎপাদন করে।
৩. স্নেহ বা চর্বি – তাপ ও শক্তি উৎপাদন করে।

এছাড়া অন্যান্য তিন প্রকার উপাদান বিশেষ প্রয়োজন। যথা—

১. খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিন – রোগ প্রতিরোধ, শক্তি বৃদ্ধি, বিভিন্ন জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়ায় উদ্দীপনা যোগায়।
২. খনিজ লবণ – বিভিন্ন জৈবিক প্রক্রিয়ায় অংশ নেয়।
৩. পানি – দেহে পানির সমতা রক্ষা করে, কোষের গুণাবলি নিয়ন্ত্রণ করে এবং কোষ অঙ্গাণুসমূহকে ধারণ ও তাপের সমতা রক্ষা করে।

## পাঠ ২ ও ৩ : শর্করা ও আমিষ

## শর্করা বা শ্বেতসার

আমরা নাস্তায় রুটি, মুড়ি, চিড়া, পঁউরুটি ইত্যাদি খাই। এগুলো শর্করা জাতীয় খাদ্য। শর্করা শক্তি উৎপাদনকারী খাদ্য। আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যের বিভিন্ন উপাদানগুলোর মধ্যে শর্করার পরিমাণ সবচেয়ে বেশি থাকে। শর্করা সহজপাচ্য। সব শর্করাই কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন এই তিনটি মৌলিক উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত। শর্করা দেহের কর্মক্ষমতা যোগায়। গ্লুকোজ এক ধরনের সরল শর্করা।

রাসায়নিক গঠনপদ্ধতি অনুসারে সব শর্করাকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। একটি মাত্র শর্করা অণু দিয়ে গঠিত হয় মনোস্যাকারাইড। একে সরল শর্করাও বলে। দ্বি-শর্করা ও বহু শর্করা পরিপাকের মাধ্যমে সরল শর্করায় পরিণত হয়ে দেহের শোষণযোগ্য হয়। মানবদেহ পরিপুষ্টির জন্য সরল শর্করা অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ মানবদেহ শুধুমাত্র সরল শর্করা গ্রহণ করতে পারে। গ্লুকোজ, ফ্রুকটোজ, গ্যালাকটোজ এ তিনটি শর্করার মধ্যে গ্লুকোজ রক্তের মাধ্যমে সারা দেহে পরিবাহিত হয়।



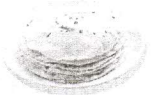
ভাত



আলু



মুড়ি



রুটি

চিত্র ১৩.১ : শর্করা জাতীয় খাদ্য

শর্করা, স্নেহ ও আমিষের মধ্যে শর্করা সর্বাপেক্ষা সহজপাচ্য। দেহে শোষিত হওয়ার পর শর্করা খুব কম সময়ে তাপ উৎপন্ন করে দেহে শক্তি যোগায়। ১ গ্রাম শর্করা ৪ কিলোক্যালরি তাপ উৎপন্ন করে। মানবদেহে প্রায় ৩০০-৪০০ গ্রাম শর্করা জমা থাকতে পারে। এ পরিমাণ শর্করা ১২০০-১৬০০ কিলোক্যালরি তাপ উৎপন্ন করে দেহের শক্তি যোগায়।

বয়স, দেহের ওজন, উচ্চতা, পরিশ্রমের মাত্রার উপর শর্করার চাহিদা নির্ভর করে। একজন পূর্ণ বয়স্ক পুরুষের দৈনিক শর্করার চাহিদা তার দেহের প্রতি কিলোগ্রাম ওজনের ৪.৬ গ্রাম হয়ে থাকে। একজন ৬০ কেজি ওজনের পুরুষ মানুষের গড়ে দৈনিক শর্করার চাহিদা = (৬০×৪.৬) গ্রাম বা ২৭৬ গ্রাম। আমাদের মোট প্রয়োজনীয় কার্যালির শতকরা ৬০-৭০ ভাগ শর্করা হতে গ্রহণ করা দরকার।



**কাজ :** শর্করা বা শ্বেতসারের উপস্থিতি নির্ণয়

**প্রয়োজনীয় উপকরণ :** এরাবুট দ্রবণ বা ভাতের মাড়, টেস্ট টিউব, আয়োডিন, পানি ও ড্রপার

**পদ্ধতি :** সামান্য পরিমাণ এরাবুট দ্রবণ বা ভাতের মাড় একটি টেস্টটিউবে নাও এবং এর সাথে সামান্য পরিমাণ পানি মেশাও। এবার এর ভিতর দুই-তিন ফোঁটা আয়োডিন দ্রবণ মেশাও। কী ঘটে দেখে? দ্রবণটি নীল বর্ণ ধারণ করবে। এ থেকে উক্ত দ্রবণে শর্করা বা শ্বেতসারের উপস্থিতি নির্ণয় করা যায়।

### অভাবজনিত রোগ

আহারে কম বা বেশি শর্করা গ্রহণ উভয়ই দেহের জন্য ক্ষতিকর। শর্করার অভাবে অপুষ্টি দেখা দেয়। রক্তে শর্করার পরিমাণ কমে গেলে দেহে বিপাক ক্রিয়ার সমস্যা সৃষ্টি হয়। রক্তে শর্করার মাত্রা কমে গেলে হাইপোগ্লাইসিমিয়ার লক্ষণ দেখা দেয়।

যেমন- ক্ষুধা অনুভব করা, বমি বমি ভাব, অতিরিক্ত ঘামানো, হৃৎকম্পন বেড়ে বা কমে যাওয়া।

### আমিষ বা প্রোটিন

আমিষ আমাদের দেহের গঠন উপাদান। কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ও সালফারের সমন্বয়ে আমিষ গঠিত। আমিষে ১৬% নাইট্রোজেন থাকে। পুষ্টি বিজ্ঞানে আমিষ একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়। আমিষ হলো অ্যামাইনো এসিডের একটি জটিল যৌগ। পরিপাক প্রক্রিয়া দ্বারা এটি দেহে শোষণ উপযোগী অ্যামাইনো এসিডে পরিণত হয়। এ পর্যন্ত প্রকৃতিজাত দ্রব্যে ২২ প্রকার অ্যামাইনো এসিডের সন্ধান পাওয়া গেছে। আমরা বাংলা বা ইংরেজি বর্ণমালাগুলো সাজিয়ে যেমন অসংখ্য শব্দ গঠন করতে পারি, তেমনি ২২টি অ্যামাইনো এসিড বিভিন্ন সংখ্যায়, বিভিন্নভাবে এবং বিভিন্ন আঙ্গিকে মিলিত হয়ে আমিষের উৎপত্তি ঘটায়। এ কারণে মাছ, দুধ, মাংস ইত্যাদি খাবারের স্বাদ, গন্ধ ও বর্ণের তারতম্য দেখা যায়।

দেহের বৃদ্ধি, ক্ষয়পূরণ ও নাইট্রোজেনের সমতা রক্ষার জন্য অ্যামাইনো এসিড অত্যন্ত প্রয়োজন। কিছু কিছু অ্যামাইনো এসিডকে অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো এসিড বলে। অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো এসিড দেহে তৈরি হয় না। খাদ্য থেকে এ অ্যামাইনো এসিডগুলো সংগ্রহ করতে হয়।

অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো এসিডের অভাব ঘটলে নানা রোগের উপসর্গ দেখা দেয়। যেমন- বমি বমি ভাব, মূত্রে জৈব এসিডের পরিমাণ বেড়ে যাওয়া, নাইট্রোজেনের ভারসাম্য বজায় না থাকা ইত্যাদি।



ডাল



দুধ



মাছ



মাংস

চিত্র ১৩.২ : আমিষ জাতীয় খাদ্য

সব আমিষ দেহে সমান পরিমাণে শোষিত হয় না। আমিষ জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করার পর এর শতকরা যত ভাগ অম্ল থেকে দেহে শোষিত হয় তত ভাগকে সেই আমিষের সহজপাচ্যতার গুণক ধরা হয়। সহজপাচ্যতার উপর



আমিষের পুষ্টিমান নির্ভর করে। যে আমিষ শতকরা ১০০ ভাগই দেহে শোষিত হয় এবং দেহের বৃদ্ধি ও ক্ষয়পূরণে কাজ করে তার সহজপাচ্যতার গুণক ১। এক্ষেত্রে আমিষ গ্রহণ এবং দেহের ধারণের পরিমাণ সমান। সহজ অর্থে বলতে গেলে যতটুকু আমিষ গ্রহণ করা হয় তার সম্পূর্ণটাই দেহের বৃদ্ধি ও ক্ষয়পূরণে কাজ করে। আর তা না হলে সহজপাচ্যতার গুণক ১ হতে কম হয়। মায়ের দুধ ও ডিমের আমিষের সহজপাচ্যতার গুণক ১। অন্যান্য সব আমিষেরই সহজপাচ্যতার গুণক ১ হতে কম।

**কাজ :** আমিষের উপস্থিতি নির্ণয়

**প্রয়োজনীয় উপকরণ :** ডিমের সাদা অংশ, হামানদিস্তা, পানি, টেস্টটিউব, সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড, কপারসালফেট

**পদ্ধতি :** সামান্য পরিমাণ আমিষ জাতীয় খাদ্য (ডিমের সাদা অংশ) হামানদিস্তার সাহায্যে পিষে ফেলতে হবে। ভালো করে পিষে ফেলার জন্য সামান্য পরিমাণ পানি মেশানো যেতে পারে। এবার টেস্টটিউবে সামান্য পরিমাণ আমিষের দ্রবণ নাও। উক্ত দ্রবণে কয়েক ফোঁটা সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের দ্রবণ এবং কয়েক ফোঁটা কপার সালফেট দ্রবণ মেশাও। এতে উক্ত দ্রবণে কোনো পরিবর্তন লক্ষ করছ কি?

আমিষের দ্রবণের সাথে রাসায়নিক দ্রব্যগুলো মিশানোর পর দ্রবণটি বেগুনি রং ধারণ করেছে। এভাবে উক্ত দ্রবণে আমিষের উপস্থিতি নির্ণয় করা যায়।

### আমিষের অভাবজনিত রোগ

খাদ্যে পরিমিত প্রয়োজনীয় জৈব আমিষ বা মিশ্র আমিষ না থাকলে শিশুর দেহে আমিষের অভাবজনিত সমস্যার সৃষ্টি হয়। দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও গঠন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শিশু পুষ্টিহীনতায় ভুগলে দেহের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। শিশুদের কোয়াশিয়রকর ও মেরাসমাস রোগ দেখা দেয়।

#### কোয়াশিয়রকর রোগের লক্ষণ

- শিশুদের খাওয়ায় অরুচি হয়।
- পেশি শীর্ণ ও দুর্বল হতে থাকে, চামড়া এবং চুলের মসৃণতা ও রং নষ্ট হয়ে যায়।
- ডায়রিয়া রোগ হয়, শরীরে পানি আসে।
- পেট বড় হয়।

উপযুক্ত চিকিৎসার দ্বারা এ রোগ নিরাময় হলেও দেহে মানসিক স্থবিরতা আসে। কোয়াশিয়রকর রোগ মারাত্মক হলে শিশুর মৃত্যুও হতে পারে।

#### মেরাসমাস রোগের লক্ষণ

- আমিষ ও ক্যালরি উভয়েরই অভাব ঘটে, ফলে দেহের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়।
- শরীর ক্ষীণ হয়ে অস্থিচর্মসার হয়।
- চামড়া বা ত্বক খসখসে হয়ে ঝুলে পড়ে।
- শরীরের ওজন হ্রাস পায়।

নিচের সারণীতে ক্যালরির ব্যবহার ও খাদ্য চাহিদা দেখানো হলো

শিশু, নারী ও পুরুষের বিভিন্ন বয়সে দৈনিক ক্যালরির বরাদ্দ

বয়স (বৎসর)	গড় ওজন (কিলোগ্রাম)	গড় শক্তি (কিলোক্যালরি)	বয়স (বৎসর)	গড় ওজন (কিলোগ্রাম)	গড় শক্তি (কিলোক্যালরি)
বাচ্চা			নারী		
০.০-০.৫ মাস	৬	১১৫	১০-১২	৩০	১৯০০
০.৬ মাস-১.০ বছর	৯	১০০	১৩-১৫	৪২	২২০০
শিশু			১৬-১৯	৫১	২১০০
১ - ৩	১৩	১৩০০	২০-৩৯	৫৪	২০০০
৪ - ৬	২০	১৫০০	৪০-৪৯	৫৩	১৯০০
৭ - ১০	২৮	১৮০০	৫০-৫৯	৫২	১৮০০
পুরুষ			৬০-৬৯	৫১	১৬০০
১০ - ১২	৪০	২২০০	৭০+	৫১	১৪০০
১৩ - ১৫	৪৪	২৫০০	সন্তান সম্ভবা		
১৬ - ১৯	৬৭	৩০০০	মাতার		
২০ - ৩৯	৬৭	২৭০০	অতিরিক্ত চাহিদা		
৪০ - ৪৯	৭০	২৪০০	প্রথম ৩ মাসে		+১৫০
৫০ - ৫৯	৬৮	২৩০০	দ্বিতীয় ৩ মাসে		+২০০
৬০ - ৬৯	৬৫	২২০০	তৃতীয় ৩ মাসে		+৩০০
৭০ +	৬৫	১৯০০	প্রসূতি মাতার		+৪০০
			অতিরিক্ত		
			চাহিদা		

একজন লোকের কী পরিমাণ শক্তি দরকার তা আমরা কেমন করে জানতে পারব? একজন লোকের দৈনিক কী পরিমাণ শক্তির দরকার তা প্রধানত তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। ১. মৌলবিপাক ২. দৈহিক পরিশ্রম ও ৩. খাদ্যের প্রভাব।

দৈনিক খাদ্য আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী হওয়া উচিত। খাদ্য নির্বাচনের সময় আমাদের লক্ষ রাখতে হবে যে, খাদ্য থেকে দেহ যেন প্রয়োজনীয় পরিমাণ ক্যালরি পেতে পারে এবং ভিটামিন, খনিজ লবণ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো যেন এতে থাকে।

### পাঠ ৬ : খাদ্যপ্রাপ বা ভিটামিন

বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে বিজ্ঞানীগণ প্রমাণ করেছেন যে, খাদ্যে শর্করা, আমিষ, স্নেহ পদার্থ, খনিজ লবণ ছাড়াও আরও কতগুলো সূক্ষ্ম উপাদানের প্রয়োজন। এর অভাবে শরীর নানা রোগে (যেমন- রাতকানা, বেরিবেরি, স্কার্ভি ইত্যাদি) আক্রান্ত হয়। ভিটামিন বলতে আমরা খাদ্যের ঐ সব জৈব রাসায়নিক পদার্থকে বুঝি যা খাদ্যে সামান্য পরিমাণে উপস্থিত থাকে। ভিটামিনসমূহ প্রত্যক্ষভাবে দেহ গঠনে অংশগ্রহণ না করলেও এদের অভাবে দেহের ক্ষয়পূরণ, বৃদ্ধিসাধন বা তাপশক্তি উৎপাদন ইত্যাদি বিভিন্ন ক্রিয়াগুলো সুসম্পন্ন হতে পারে না।



ভিটামিনের প্রকারভেদ : দ্রবণীয়তার গুণ অনুসারে ভিটামিনকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১. স্নেহ জাতীয় পদার্থে দ্রবণীয় ভিটামিন, যেমন- এ, ডি, ই, এবং কে।
২. পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন, যেমন- ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স এবং সি।

ভিটামিনের উৎস : গাছের সবুজ পাতা, কচি ডগা, হলুদ ও সবুজ বর্ণের সবজি, ফল ও বীজ ইত্যাদি অংশে ভিটামিন থাকে।

### ভিটামিন এ

উৎস : মাছের তেল ও প্রাণিজ স্নেহে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন 'এ' পাওয়া যায়। ক্যারোটিন সমৃদ্ধ শাকসবজি যেমন- লালশাক, পুঁইশাক, পালংশাক, টমেটো, গাজর, বীট ও মিষ্টি কুমড়া ইত্যাদি। বিভিন্ন ধরনের ফল যেমন- পেঁপে, আম, কাঁঠালে ভিটামিন 'এ' থাকে। মলা ও ঢেলা মাছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন 'এ' থাকে।

কাজ : দৃষ্টিশক্তি স্বাভাবিক রাখা, ত্বক ও শ্লেষ্মাবিল্লিকে সুস্থ রাখা এবং দেহকে বিভিন্ন সংক্রামক রোগের হাত থেকে রক্ষা করা, খাদ্যদ্রব্য পরিপাক ও ক্ষুধার উদ্রেক করা, রক্তে স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রাখা ও দেহের পুষ্টি ও বৃদ্ধিতে সহায়তা করা।

### অভাবজনিত রোগ

১. রাতকানা : এ রোগের লক্ষণ স্বল্প আলোতে বিশেষ করে রাতে আবছা আলোতে দেখতে না পাওয়া। শিশুরা এ রোগে বেশি আক্রান্ত হয়। দীর্ঘদিন ধরে এ অবস্থা চলতে থাকলে চোখ সম্পূর্ণরূপে অন্ধ হয়ে যেতে পারে। এ রোগে আক্রান্ত শিশুকে সবুজ শাকসবজি ও রঙিন ফলমূল খাওয়ানো উচিত। ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল রাতকানা রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে। আমাদের দেশে টিকা দিবসে বিভিন্ন টিকা কেন্দ্রে শিশুকে ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়ানো হয়।

২. জেরপথালমিয়া : ভিটামিন 'এ' এর অভাব ঘটলে চোখের কর্নিয়ার আচ্ছাদন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কর্নিয়ার উপর শুষক স্তর পড়ে। তখন চোখ শুকিয়ে যায় এবং পানি পড়া বন্ধ হয়ে যায়। চোখে আলো সহ্য হয় না, চোখে পুঁজ জমে এবং চোখের পাতা ফুলে যায়।

এ অবস্থায় উপযুক্ত চিকিৎসা করলে এ রোগ থেকে উপশম পাওয়া যেতে পারে। তবে সময় মতো চিকিৎসা না হলে শিশু অন্ধ হয়ে যেতে পারে।

এ ছাড়া ভিটামিন 'এ' এর অভাব ঘটলে দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। সর্দি, কাশি, ইনফ্লুয়েঞ্জা ইত্যাদি রোগ হতে পারে।

### ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স

ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স এর কাজ হলো বিশেষ বিশেষ উৎসেচকের অংশ হিসেবে আমিষ, শর্করা ও স্নেহ পদার্থকে বিশ্লিষ্ট করে এবং এদের অন্তর্নিহিত শক্তিকে মুক্ত হতে সাহায্য করে।

ভিটামিন বি<sub>১</sub> (থায়ামিন) : এর প্রধান কাজ হলো শর্করা বিপাকে অংশগ্রহণ করে শক্তিমুক্ত করা। তাছাড়া স্বাভাবিক ক্ষুধা বজায় রাখতে এবং স্নায়ুতন্ত্রকে সক্রিয় রাখতে সহায়তা করে।

ভিটামিন বি<sub>২</sub> (রিবোফ্লেবিন) : অ্যামাইনো এসিড, ফ্যাটি এসিড ও কার্বহাইড্রেটের বিপাকে অংশ নিয়ে শক্তি উৎপাদনে সাহায্য করে।

ভিটামিন বি<sub>৬</sub> (পাইরিডক্সিন) : শক্তি উৎপাদনে সহায়তা করে।

ভিটামিন বি<sub>১২</sub> (সায়ানোকোবালামিন) : লোহিত রক্তকণিকা বৃদ্ধি ও উৎপাদনে সহায়তা করে। শ্বেত রক্তকণিকা ও অনুচক্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

### পাঠ ৭ : ভিটামিন 'সি'

দেহের জন্য ভিটামিন 'সি' অতি প্রয়োজনীয় উপাদান। এ ভিটামিন পানিতে দ্রবীভূত হয় এবং সামান্য তাপেই নষ্ট হয়ে যায়। ভিটামিন 'সি' দেহে জমা থাকে না তাই প্রতিদিন খাওয়া দরকার। টক জাতীয় ফল আমলকী, আনারস, পেয়ারা, কমলালেবু, লেবু, আমড়া ইত্যাদি ফলে প্রচুর ভিটামিন 'সি' থাকে। সবুজ শাকসবজি, ফুলকপি, বাঁধাকপি, টমেটো, লেটুসপাতা থেকে আমরা ভিটামিন 'সি' পাই। পাকা ফল অপেক্ষা কাঁচা সবজি ও ফলে এ ভিটামিন বেশি থাকে।

ভিটামিন 'সি' পেশি ও দাঁত মজবুত করে, ক্ষত নিরাময় ও চর্মরোগ রোধে সহায়তা করে, কণ্ঠনালি ও নাকের সংক্রমণ প্রতিরোধ করে।

### অভাবজনিত রোগ

প্রাপ্ত বয়স্কদের দেহে ভিটামিন 'সি'-এর অভাব প্রকট হলে নিচের লক্ষণগুলো দেখা দেয় :

- হাড়ের গঠন শক্ত ও মজবুত হতে পারে না।
- হাড় দুর্বল ও ভঙ্গুর হয়ে যায়।
- ত্বক খসখসে হয়, চুলকায়, ত্বকে ঘা হলে সহজে তা শূকাতে চায় না।

### স্কার্ভি

- দাঁতের মাড়ি ফুলে নরম হয়ে যায়।
- দাঁতের গোড়া আলগা হয়ে যায় এবং গোড়া থেকে রক্ত পড়ে।
- দাঁতের এনামেল উঠে যায় এতে অকালে দাঁত পড়ে যেতে পারে। শিশু ও বয়স্কদের এ রোগ বেশি হয়।
- গ্রন্থি ফুলে যায় এবং মুখে ব্যথা হয়।
- রক্তক্ষরণ সহজে বন্ধ হয় না, ঘা শূকাতে দেরি হয়।
- অন্যান্য রোগ বিশেষ করে সর্দি, কাশি খুব সহজে আক্রমণ করে।

### প্রতিকার

এ অবস্থায় ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া অত্যন্ত জরুরি।



## প্রতিরোধ

কোলের শিশুকে মায়ের দুধের সঙ্গে অন্যান্য পরিপূরক খাদ্য যেমন ফলের রস, সবজির সুপ ইত্যাদি খাওয়াতে হবে।

## ভিটামিন 'ডি'

ভোজ্য তেল, দুগ্ধ ও দুগ্ধ জাতীয় খাদ্য, বিভিন্ন মাছের তেল, ডিমের কুসুম, মাখন, ঘি, চর্বি এবং ইলিশ মাছে পর্যাপ্ত পরিমাণে ভিটামিন 'ডি' পাওয়া যায়।

## কাজ

- অস্থি ও দাঁতের কাঠামো গঠন।
- অল্পে ক্যালসিয়াম শোষণ বাড়ায়।
- রক্ত প্রবাহে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে।

## অভাবজনিত রোগ

ভিটামিন 'ডি' এর অভাবে লোহার শোষণ, সঞ্চয় ও হিমোগ্লোবিন তৈরিতে বিঘ্ন ঘটে।

## রিকেটস

## রিকেটস রোগের লক্ষণ

- ভিটামিন ডি ও ক্যালসিয়ামের অভাবে শিশুদের হাড় নরম হয়ে যায় এবং বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।
- পায়ের হাড় ধনুকের মতো বেঁকে যায় এবং দেহের চাপে অন্যান্য হাড়গুলোও বেঁকে যায়।
- হাত-পায়ের অস্থিসন্ধি বা গিট ফুলে যায়।
- বুকের হাড় বা পাজরের হাড় বেঁকে যায়।

## প্রতিকার

এ অবস্থায় ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া অত্যন্ত জরুরি।

## প্রতিরোধ

শিশুকে ভিটামিন 'ডি' সমৃদ্ধ খাবার খাওয়ানো উচিত। সূর্যরশ্মি থেকে ভিটামিন ডি পাওয়া যায়। তাই শিশুকে কিছুক্ষণের জন্য রৌদ্রে খেলাধুলা করতে দেওয়া উচিত।

## অস্টিওম্যালাশিয়া

বয়স্কদের রিকেটস অস্টিওম্যালাশিয়া নামে পরিচিত। এই রোগের লক্ষণগুলো নিম্নরূপ -

- ভিটামিন 'ডি' এর অভাবে ক্যালসিয়াম শোষণে বিঘ্ন ঘটে।
- ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের সঞ্চয় কমে থাকে।
- থাইরয়েড গ্রন্থির কাজের পরিবর্তন ঘটে।
- অস্থি দুর্বল হয়ে অস্থির কাঠিন্য কমে যায় এবং হালকা আঘাতেই অস্থি ভেঙ্গে যাওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকে।

### প্রতিকার

উপরের লক্ষণগুলো দেখা দিলে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া অত্যন্ত জরুরি। উপযুক্ত পরিমাণ ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন 'ডি' যুক্ত খাবার গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে উক্ত উপাদানগুলোর জন্য ঔষধ সেবন করা একান্ত জরুরি।

### প্রতিরোধ

- শিশুকাল থেকেই ভিটামিন 'ডি' ও ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ খাবার খাওয়া সুনিশ্চিত করতে হবে।
- শিশুদেরকে কিছুক্ষণের জন্য রৌদ্রে খেলাধুলার ব্যবস্থা করতে হবে।

### ভিটামিন 'ই'

ভোজ্যতেল ভিটামিন 'ই' এর সবচেয়ে ভালো উৎস। শস্যদানা, যকৃৎ, মাছ-মাংসের চর্বিতে ভিটামিন 'ই' পাওয়া যায়।

### কাজ

- ভিটামিন 'ই' কোষ গঠনে সহায়তা করে।
- শরীরের কিছু ক্রিয়া-বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে।
- খুব কম ক্ষেত্রে ভিটামিন 'ই' এর অভাব ঘটে এবং এর অভাবজনিত লক্ষণও কম।

### ভিটামিন 'কে'

সবুজ রঙের শাকসবজি, লেটুসপাতা, ফুলকপি, বাঁধাকপি, ডিমের কুসুম, সয়াবিন তেল এবং যকৃতে ভিটামিন 'কে' পাওয়া যায়।

### কাজ

- দেহে ভিটামিন 'কে' প্রথ্রোম্বিন নামক প্রোটিন তৈরি করে।
- প্রথ্রোম্বিন রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে।

### অভাবজনিত সমস্যা

যকৃৎ থেকে পিত্তরস নিঃসৃত হয়। পিত্তরস নিঃসরণে অসুবিধা হলে ভিটামিন কে-এর শোষণ কমে যায়। ভিটামিন 'কে'-এর অভাবে ত্বকের নিচে ও দেহভ্যন্তরে যে রক্ত ক্ষরণ হয় তা বন্ধ করার ব্যবস্থা না নিলে রোগী মারা যেতে পারে। এই ভিটামিনের অভাবে অপারেশনের রোগীর রক্তক্ষরণ সহজে বন্ধ হতে চায় না। এতে রোগীর জীবন নাশের আশংকা বেশি থাকে।

নিচের ছকটি পূরণ কর

ভিটামিন	উৎস	কাজ	অভাবজনিত রোগ
'এ'			
'সি'			
'ডি'			
'কে'			



## পাঠ ৮ : খনিজ লবণ

ভাত এবং তরকারির সাথে আমরা প্রত্যহ খাবার লবণ খাই, এছাড়া আরও অনেক প্রকার লবণ আছে যা আমাদের দেহের জন্য অতীব প্রয়োজন। খাদ্যে খনিজ লবণ, আমিষ, শর্করা, স্নেহ পদার্থের মতো দেহে তাপ উৎপন্ন করে না। কিন্তু দেহকোষ ও দেহে তরলের জন্য খনিজ লবণ একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ফসফরাস, ফ্লোরিন, আয়োডিন, লৌহ, সালফার ইত্যাদি লবণ জাতীয় দ্রব্য খাদ্যের সাথে দেহে প্রবেশ করে ও দেহ গঠনে সাহায্য করে। এসব উপাদান দেহে মৌলিক উপাদান হিসেবে থাকে না, অন্য পদার্থের সঙ্গে জৈব ও অজৈব যৌগরূপে থাকে। প্রধানত দুই ভাবে খনিজ লবণ দেহে কাজ করে। যথা- দেহ গঠন উপাদানরূপে ও দেহ অভ্যন্তরীণ কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। মাংস, ডিম, দুধ, সবুজ শাকসবজি এবং ফল খনিজ লবণের প্রধান উৎস।

খনিজ লবণ দেহ গঠন ও দেহের অভ্যন্তরীণ কাজ নিয়ন্ত্রণ করে, অস্থি, দাঁত, এনজাইম ও হরমোন গঠনের জন্য খনিজ লবণ অপরিহার্য উপাদান, স্নায়ু উদ্দীপনা ও পেশি সংকোচন নিয়ন্ত্রণ করে, দেহের জলীয় অংশে সমতা রক্ষা করে ও বিভিন্ন এনজাইম সক্রিয় রাখে।

### মানবদেহে খনিজ লবণের প্রয়োজনীয়তা

ক্যালসিয়াম দাঁত ও হাড় গঠনে, রক্ত জমাট বাঁধতে, স্নায়ু ব্যবস্থায় সুষ্ঠু কাজ সম্পাদনে সহায়তা করে। ফসফরাস দাঁত ও হাড় গঠন, ফসফোলিপিড তৈরি করে। লৌহ রক্তের লোহিত রক্তকণিকা গঠন, উৎসেচক বা এনজাইমের কার্যকারিতায় সহায়তা করে। আয়োডিন থাইরয়েড গ্রন্থির কাজ ও বিপাকের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনে সহায়তা করে। দেহের অধিকাংশ কোষ ও দেহরসের জন্য সোডিয়াম প্রয়োজন। পেশি সংকোচনে পটাশিয়াম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

## পাঠ ৯ : অভাবজনিত রোগ

রিকেটস : দেহে ভিটামিন 'ডি'-এর সঙ্গে ক্যালসিয়াম শোষিত হয়। এই ভিটামিনের অভাবে রিকেটস রোগ হয়। ভিটামিন অংশে এর বর্ণনা তোমরা পড়েছ।

গলগন্ড : গলগন্ড রোগকে ঘ্যাগ বলে। আমাদের দেশের উত্তরাঞ্চলে বিশেষ করে রংপুর, দিনাজপুর, জামালপুর ও ময়মনসিংহে এ রোগের প্রকোপ বেশি। যখন আমাদের রক্তে কোনো কারণে আয়োডিনের অভাব ঘটে তখন গলায় অবস্থিত থাইরয়েডগ্রন্থি ক্রমশ আকারে বড় হতে থাকে। গলা ফুলে যায়। একে গলগন্ড বা ঘ্যাগ বলে। এ রোগের লক্ষণগুলো নিম্নরূপ :

- থাইরয়েডগ্রন্থি ফুলে যায়, শ্বাস নিতে কষ্ট হয়।
- শ্বাস-প্রশ্বাসের সময় শব্দ হয়।
- গলার আওয়াজ ফাঁসফেঁসে হয়ে যায়।
- গলায় অস্বস্তিবোধ হয়, খাবার গিলতে কষ্ট হয়।
- আক্রান্ত ব্যক্তি অবসাদ ও দুর্বলতাবোধ করে।

### প্রতিকার

রোগের প্রাথমিক অবস্থায় আয়োডিনযুক্ত লবণ, সামুদ্রিক মাছ, মাছের তেল ও সামুদ্রিক শৈবাল ইত্যাদি খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তোলা। প্রয়োজনে ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে সু-চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

### ক্রোটিনিজম

সাধারণত আয়োডিনের অভাবে শিশুদের এ রোগ হয়। এই রোগে আক্রান্ত শিশুর দেহে যে লক্ষণগুলো দেখা দেয় তা হলো—

- দেহের বর্ধন মন্থর হয়।
- পুরু ত্বক, মুখমণ্ডলের পরিবর্তন দেখা দেয়।
- পুরু ঠোঁট, বড় জিহ্বা, মানসিক প্রতিবন্ধী হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

### প্রতিকার

যথাসময়ে সঠিক চিকিৎসা করা হলে শিশুদের দৈহিক অসুবিধাগুলো দূর হয় ও স্বাভাবিক বৃদ্ধি ঠিক রাখা যায়।

### প্রতিরোধ

খাবারে আয়োডিনযুক্ত লবণ দিয়ে এ রোগ প্রতিরোধ করা যায়।

### রক্তাল্পতা বা এ্যানিমিয়া

লোহা, লোহিত রক্তকণিকার হিমোগ্লোবিনের গঠন উপাদান। শিশু ও সন্তান সম্ভবা মায়ের খাদ্যে লোহার ঘাটতির জন্য রক্তাল্পতা দেখা যায়। সাধারণত শিশুদের পেটে কৃমি হলে রক্তাল্পতা দেখা দিতে পারে। এর লক্ষণগুলো হলো—

- দুর্বলতাবোধ, মাথা, গা ঝিমঝিম করা।
- বুক ধড়ফড় করা।
- মাথা ঘোরানো, অল্প পরিশ্রমে হাঁপিয়ে উঠা।
- ওজন হ্রাস ও খাওয়ান অল্প দেখা দেয়।

### প্রতিকার

লৌহ সমৃদ্ধ শাকসবজি, ফল, মাংস, ডিমের কুসুম, যকৃৎ ও বৃক্ক ইত্যাদি বেশি করে খাওয়া। প্রয়োজনে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ঔষধ সেবন করা। রোগ কঠিন আকার ধারণ করলে হৃৎপিণ্ডের দ্রুত রক্ত সঞ্চালন ও হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে মৃত্যু হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।



## পানি

পানি জীবন ধারণের জন্য একটি অপরিহার্য উপাদান। প্রাণী দেহের ৬০-৭০ ভাগই পানি। দেহ গঠনে পানির প্রয়োজনীয়তা সবচেয়ে বেশি। এ পানি অস্থি, মাংস, ত্বক, নখ, দাঁত ইত্যাদি কোষের ভিতরে ও বাইরে থাকে। প্রায় সব খাদ্যেই কম-বেশি পানি থাকে। তবে আমরা আলাদাভাবে পানি পান করে দেহের চাহিদা মেটাই।

দেহ গঠন ছাড়াও পানি দেহের সব অভ্যন্তরীণ কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। পানি ছাড়া দেহের ভিতরে কোনো রাসায়নিক ক্রিয়া হতে পারে না। পানি দেহে দ্রাবক রূপে কাজ করে। বিভিন্ন খনিজ লবণ পানিতে দ্রবীভূত থাকে। পানিতে দ্রবণীয় অবস্থায় খাদ্যের পরিপাক ক্রিয়া চলে। আবার পানিতে দ্রবীভূত থেকেই খাদ্য উপাদান দেহে শোষিত হয়।

## কাজ

- পানির জন্যই রক্ত সঞ্চালন ও তাপ নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয়।
- পানি দেহ থেকে দূষিত পদার্থ অপসারণ করে। যেমন- মূত্র ও ঘাম।

কলেরা ও উদরাময় রোগে মলের সঙ্গে বা বমির সঙ্গে দেহ থেকে হঠাৎ বেশ কিছু পানি বের হয়ে যায়। ফলে দেহে পানি শূন্যতার সৃষ্টি হয়। কলেরা বা উদরাময় রোগ হলে রোগীকে স্যালাইন বা লবণ পানির শরবত খাওয়াতে হবে। এটা কলেরা বা উদরাময়ের সবচেয়ে সহজ চিকিৎসা। এছাড়া আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণাকেন্দ্র কর্তৃক তৈরি খাওয়ার স্যালাইনের প্যাকেট পাওয়া যায়। প্যাকেটের স্যালাইন পানিতে গুলে রোগীকে খাওয়াতে হয়। সম্প্রতি শস্য স্যালাইন নামক আর একটি খাওয়ার স্যালাইন উদ্ভাবিত হয়েছে। ১ লিটার পানি, ৫০ গ্রাম চালের গুঁড়া ও এক চিমটি লবণ মিলিয়ে এ স্যালাইন তৈরি করা হয়।

কাজ : তোমরা পূর্বের শ্রেণিতে খাবার স্যালাইন বানাতে শিবেছ। এবার তোমরা পুনরায় খাবার স্যালাইন তৈরি কর। স্যালাইন তৈরির সময় তোমরা কী কী সাবধানতা অবলম্বন করবে তা লিপিবদ্ধ করবে।

## শুষ্কতা

কোনো কারণে দেহে পানির পরিমাণ কমে গেলে কোষগুলোতে পানির স্বল্পতা দেখা দেয়। কোষের পানি কমে গেলে অতিরিক্ত পিপাসা হয়, রক্তের চাপ কমে যায়, রক্ত সঞ্চালনে অসুবিধা হয়, বিপাক ক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটে। পানির অভাবে দেহের ওজন কমে যায় এবং পেশি ও স্নায়ুকোষ দুর্বল হয়ে পড়ে। দেহে পানির পরিমাণ ২০ শতাংশের নিচে নেমে গেলে দেহের স্বাভাবিক কাজে বিঘ্ন ঘটে, ফলে রোগী অচেতন হয়ে পড়ে, এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে।

## রাফেজ বা আঁশযুক্ত খাদ্য

শস্যাদানা, ফলমূল, সবজির অপাচ্য অংশকে রাফেজ বলে। দেহের ভিতর রাফেজের কোনো পরিবর্তন ঘটে না। রাফেজ কোনো পুষ্টি উপাদান নয়। তবে স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। রাফেজ পৌষ্টিক নাগির ভিতর দিয়ে সরাসরি স্থানান্তরিত হয়। ফল ও সবজির রাফেজ, সেলুলোজ নির্মিত কোষপ্রাচীর। আঁশযুক্ত খাবার থেকে রাফেজ পাওয়া যায়।

## খাদ্য নির্বাচন

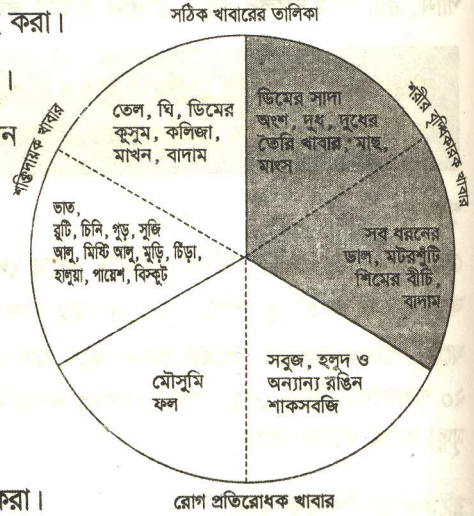
যে সমস্ত খাদ্যবস্তু দেহের ক্যালরি চাহিদা পূরণ করে, টিস্যু কোষের বৃদ্ধি ও গঠন বজায় রাখে এবং দেহের শারীরবৃত্তীয় কার্যাবলীকে সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে তাকে সুস্বাদু খাদ্য বলে। অর্থাৎ সুস্বাদু খাদ্য বলতে বোঝায় ৬টি উপাদান বিশিষ্ট পরিমাণ মতো খাবার যা ব্যক্তিবিশেষের দেহের চাহিদা মেটায়। বয়স, লিঙ্গভেদ, দৈনিক অবস্থা, শ্রমের পরিমাণ হিসেবে পুষ্টির প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো উপযুক্ত পরিমাণে সুস্বাদু খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকে। যে শর্ত পালনে খাবার সুস্বাদু হয় সেগুলো হলো—

১. প্রতিবেলার খাবারে আমিষ, শর্করা, স্নেহ পদার্থ এই তিনটি শ্রেণির খাবার অন্তর্ভুক্ত করে খাদ্যের ছয়টি উপাদানের অন্তর্ভুক্তিকরণ নিশ্চিত করা।
২. প্রত্যেক শ্রেণির খাদ্য বয়স, লিঙ্গ ও জীবিকা অনুযায়ী সরবরাহ করা।
৩. দৈনিক ক্যালরি ৬০-৭০% শর্করা, ১০% আমিষ ও ৩০-৪০% স্নেহ জাতীয় পদার্থ থেকে গ্রহণ করা।

## সুস্বাদু খাদ্য তালিকা

কতগুলো নিয়ম মেনে একটি সুস্বাদু খাদ্য তালিকা তৈরি করতে হবে। যথা—

১. প্রথমত খাদ্যের বিভিন্ন উপাদানগুলো ব্যক্তিবিশেষের বয়স, কর্ম ও শারীরিক অবস্থাভেদে যে বিভিন্ন ধরনের হয় সেদিকে লক্ষ রেখে খাদ্য তালিকা প্রস্তুত করা।
২. দৈনিক প্রয়োজন অনুযায়ী খাদ্যের তাপমূল্য বা ক্যালরি তাপ শক্তির পরিমাণ নিশ্চিতকরণ।
৩. খাদ্যে দেহ গঠনের ও ক্ষয়পূরণের উপযোগী আমিষ সরবরাহ করা।
৪. খাদ্যে যথোপযুক্ত ভিটামিন, খনিজ লবণ ও পানির উপস্থিতি।
৫. বিভিন্ন খাদ্যের পুষ্টিমান ও খাদ্যের শ্রেণিবিভাগ সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন। প্রথমে খাদ্যের মূল বিভাগগুলো থেকে খাদ্য বাছাই করা। খাদ্য বাছাইয়ে বৈচিত্র্য থাকা।
৬. খাদ্য তালিকা প্রস্তুতির সময় খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে সচেতন থাকা।
৭. ব্যক্তি ও পরিবারের আর্থিক সজ্ঞতির দিক ভেবে খাদ্য তালিকা প্রস্তুত করা।
৮. ঋতু ও আবহাওয়ার কথা চিন্তা করে খাদ্য তালিকা প্রস্তুত করা।



নতুন শব্দ : আমিষ, শর্করা, স্নেহ, ভিটামিন, সহজ পাচ্যতার গুণক, অ্যামাইনো এসিড, কোয়াশিয়রকর, মেরাসমাস, জেরপখালমিয়া, স্কার্ভি, রিকোটস, অস্টিওম্যাগালেশিয়া, প্রথোম্বিন, ক্রোটিনিজম, এ্যানিমিয়া



এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা যা শিখলাম—

- বিপাকক্রিয়া চালানোর জন্য যে শক্তি প্রয়োজন তাকে মৌলবিপাক বলে।
- ভিটামিন ও খনিজ লবণ আলাদা কোনো খাদ্য নয়। এগুলো অন্য খাদ্য উপাদান থেকে পাওয়া যায়।
- পানি দেহের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। পরিপাককৃত খাদ্য উপাদান পানিতে দ্রবীভূত অবস্থায় দেহের সর্বত্র পরিবাহিত হয়।

## অনুশীলনী

### সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কিলোক্যালরি কী?
২. ভিটামিন 'এ'-র অভাবে কী কী অসুবিধা দেখা দেয়?
৩. রিকেটস রোগের লক্ষণগুলো কী কী?
৪. রক্তে হিমোগ্লোবিনের প্রয়োজনীয়তা কী?

### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোনটি দেহে তাপ ও শক্তি উৎপাদন করে?

- |                |             |
|----------------|-------------|
| ক. পানি        | খ. ভিটামিন  |
| গ. স্নেহপদার্থ | ঘ. খনিজ লবণ |

২. কোন ভিটামিনের অভাবে শিশুদের রিকেটস রোগ হয়?

- |               |               |
|---------------|---------------|
| ক. ভিটামিন এ  | খ. ভিটামিন সি |
| গ. ভিটামিন ডি | ঘ. ভিটামিন ই  |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

সুমি টক খেতে পছন্দ করে না। এমনকি সে সবুজ শাকসবজি এবং টমেটোও খায় না। ইদানীং দেখা যাচ্ছে তার দাঁতের গোড়া দিয়ে রক্ত পড়ছে।

৩. সুমির কী রোগ হয়েছে?

- |             |                 |
|-------------|-----------------|
| ক. স্কার্ভি | খ. রিকেটস       |
| গ. মেরাসমাস | ঘ. কোয়াশিয়রকর |

৪. উদ্দীপকের খাদ্যগুলোর অভাবে বয়স্কদের—

- i. হাড় নরম হয়ে যায়
- ii. ত্বক চুলকায় এবং ঘা হয়
- iii. বুকের হাড় ও পঁজরে ব্যথা হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

### সৃজনশীল প্রশ্ন

১. তালহা ইদানীং কিছুই খেতে চায় না। তার খাওয়ায় অরুচি এবং বমি বমি ভাব হয়। তার ত্বক খসখসে হয়ে যাচ্ছে। ডাক্তারের শরণাপন্ন হলে ডাক্তার তাকে ডিম ও দুধ বেশি করে খেতে বললেন।

ক. খাদ্য কী?

খ. পুষ্টি বলতে কী বোঝায়?

গ. ডাক্তার তালহাকে উল্লিখিত খাবারগুলো খেতে বললেন কেন?

ঘ. ডাক্তারের পরামর্শমতো খাবার না খেলে পরবর্তীতে তালহার আরও কী সমস্যা হতে পারে? বিশ্লেষণ কর।

২. নূরজাহান বেগম তার আট বছরের ছেলে বকুলের দৈহিক বৃদ্ধি নিয়ে ভীষণ চিন্তিত। তিনি তার শারীরিক বৃদ্ধি ও সুস্থতা নিশ্চিত করার জন্য তাকে বিশেষ ধরনের খাবার খাওয়াতে শুরু করেন। তবে তিনি নিজের এবং বকুলের বাবা, দাদা ও দাদীর খাদ্য তালিকায় ভিন্ন ধরনের খাবার রাখেন।

ক. প্রোটিন কী?

খ. রাফেজ বলতে কী বোঝায়?

গ. নূরজাহান বেগম বকুলের খাদ্য তালিকা কীভাবে তৈরি করেন? বর্ণনা কর।

ঘ. নূরজাহান বেগমের পরিবারের সদস্যদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন খাদ্য নির্বাচনের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ কর।



## পরিবেশ এবং বাস্তুতন্ত্র

আমাদের চারপাশের সবকিছু নিয়েই আমাদের পরিবেশ তা তোমরা জানো। আরও জানো, একটি স্থানে যে সকল জড়বস্তু ও জীব থাকে সেগুলো নিয়েই সেখানকার পরিবেশ গড়ে উঠে। তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ, এই ভূমণ্ডলে বিভিন্ন পরিবেশ রয়েছে। এসব পরিবেশকে আমরা স্বাদু পানি, লোনা পানি ও স্থল এই প্রধান তিনটি ভাগে ভাগ করতে পারি। এই তিন রকমের পরিবেশের প্রত্যেকটিতে স্বতন্ত্র ধরনের অজীব ও জীব উপাদান থাকে।

এসব অজীব ও জীব উপাদানসমূহ একে অপরের সাথে সম্পর্কযুক্ত। তোমরা জানো, পরিবেশের জীব উপাদানসমূহের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ ও প্রাণী। জীবন ধারণের জন্য এসকল উদ্ভিদ ও প্রাণী একে অপরের সাথে সম্পর্কযুক্ত।



এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা—

- বাস্তুতন্ত্রের উপাদান ও প্রকারভেদ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- খাদ্যশৃঙ্খল ও খাদ্যজাল ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বাস্তুতন্ত্রে শক্তিপ্রবাহ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বাস্তুতন্ত্রের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারব;
- জীবে বাস্তুতন্ত্রের অবদান উপলব্ধি করব এবং সুরক্ষায় অন্যদের সচেতন করতে পারব।



## পাঠ ১ : বাস্তুতন্ত্র

পৃথিবীর বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন জীব বসবাস করে। প্রতিটি বাসস্থানের বিভিন্ন এলাকায় জলবায়ু, আবহাওয়া ও অন্যান্য অজীব এবং জীব উপাদানের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য দেখা যায়। এসব পার্থক্যের কারণে পৃথিবীজুড়ে স্থানভেদে বিচিত্র সব জীবের বসতি। বনজঙ্গলে তুমি যে ধরনের জীব দেখবে, পুকুরে বসবাসরত জীব তাদের থেকে ভিন্ন। এসব পরিবেশের জীব ও অজীব উপাদানের মধ্যে রয়েছে এক নিবিড় সম্পর্ক। আবার একটি পরিবেশের উদ্ভিদ ও প্রাণী জীবন ধারণের জন্য একে অন্যের উপর নির্ভরশীল। এভাবে যে কোনো একটি পরিবেশের অজীব এবং জীব উপাদানসমূহের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া, আদান-প্রদান ইত্যাদির মাধ্যমে পরিবেশে যে তন্ত্র গড়ে উঠে তাই বাস্তুতন্ত্র নামে পরিচিত।

পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করলে দেখতে পাবে বাস্তুতন্ত্রের সকল উপাদানের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলছে। তোমার বাড়ি অথবা বিদ্যালয়ের কাছের বাগান একটি ছোট বাস্তুতন্ত্রের উদাহরণ।

## পাঠ ২ : বাস্তুতন্ত্রের উপাদান

তোমরা জেনেছ অজীব এবং জীব এই দুটি প্রধান উপাদান নিয়ে বাস্তুতন্ত্র গঠিত।

**অজীব উপাদান :** বাস্তুতন্ত্রের প্রাণহীন সব উপাদান অজীব উপাদান নামে পরিচিত। এই অজীব উপাদান আবার দুই ধরনের। (ক) অজৈব বা ভৌত উপাদান এবং (খ) জৈব উপাদান। অজৈব উপাদানের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন প্রকার খনিজ লবণ, মাটি, আলো, পানি, বায়ু, তাপ, আর্দ্রতা ইত্যাদি। সকল জীবের মৃত ও গলিত দেহাবশেষ জৈব উপাদান নামে পরিচিত। পরিবেশের জীব উপাদানের বেঁচে থাকার জন্য এসব অজৈব ও জৈব উপাদান অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

**জীব উপাদান :** পরিবেশের সকল জীবন্ত অংশই বাস্তুতন্ত্রের জীব উপাদান। বাস্তুতন্ত্রের সকল জীব ও অজীব উপাদানের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে তা তোমরা প্রথম পাঠে জেনেছ। বাস্তুতন্ত্রকে কার্যকরী রাখার জন্য এ সকল জীব যে ধরনের ভূমিকা রাখে তার উপর ভিত্তি করে এসব জীব উপাদানকে (ক) উৎপাদক, (খ) খাদক এবং (গ) বিয়োজক এ তিন ভাগে ভাগ করা হয়।

(ক) উৎপাদক : সবুজ উদ্ভিদ যারা নিজেদের খাদ্য নিজেরা তৈরি করতে পারে তারা উৎপাদক নামে পরিচিত। যারা উৎপাদক তারা সূর্যের আলোর উপস্থিতিতে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় শর্করা জাতীয় খাদ্য তৈরি করে। যার উপর বাস্তুতন্ত্রের অন্যান্য সকল প্রাণী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল।

(খ) খাদক বা ভক্ষক : যে সকল প্রাণী উদ্ভিদ থেকে পাওয়া জৈব পদার্থ খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে বা অন্য কোনো প্রাণী খেয়ে জীবন ধারণ করে তারাই খাদক বা ভক্ষক নামে পরিচিত। বাস্তুতন্ত্রে তিন ধরনের খাদক রয়েছে।

**প্রথম স্তরের খাদক :** যে সকল প্রাণী উদ্ভিদভোজী তারা প্রথম স্তরের খাদক। এরা তৃণভোজী নামেও পরিচিত। তৃণভোজী প্রাণীদের মধ্যে রয়েছে ছোট কীটপতঙ্গ থেকে শুরু করে অনেক বড় প্রাণী। যেমন- গরু, ছাগল ইত্যাদি।

**দ্বিতীয় স্তরের খাদক :** যারা প্রথম স্তরের খাদকদেরকে খেয়ে বাঁচে। যেমন- পাখি, ব্যাঙ, মানুষ ইত্যাদি। এরা মাংসাশী বলেও পরিচিত।



তৃতীয় স্তরের খাদক বা সর্বোচ্চ খাদক : যারা দ্বিতীয় স্তরের খাদকদের খায়। যেমন- কচ্ছপ, বক, ব্যাঙ, মানুষ ইত্যাদি। এদের মধ্যে কোনো কোনো প্রাণী আবার একাধিক স্তরের খাবার খায়। এদেরকে বলা হয় সর্বভুক। আমরা যখন ডাল, ভাত, আলু ইত্যাদি খাই, তখন আমরা প্রথম স্তরের খাদক। আবার আমরা যখন মাছ, মাংস খাই, তখন আমরা দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্তরের খাদক।

(গ) বিয়োজক : এরা পচনকারী নামেও পরিচিত। পরিবেশে কিছু অণুজীব আছে, বিশেষ করে ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক যারা মৃত উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহের উপর ক্রিয়া করে। এসময় মৃত উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে। ফলে মৃতদেহ ক্রমশ বিয়োজিত হয়ে নানা রকম জৈব ও অজৈব দ্রব্যাদিতে রূপান্তরিত হয়। এসব দ্রব্যের কিছুটা ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক নিজেদের খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। মৃতদেহ থেকে তৈরি বাকি খাদ্য পরিবেশের মাটি ও বায়ুতে জমা হয়। যা উদ্ভিদ পুনরায় ব্যবহার করে। এভাবে প্রকৃতিতে অজীব ও জীব উপাদানের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া হয়ে বাস্তুসংস্থান সচল থাকে।

### পাঠ ৩-৫ : বাস্তুতন্ত্রের প্রকারভেদ

প্রাকৃতিক পরিবেশে দু'ধরনের বাস্তুতন্ত্র রয়েছে। স্থলজ এবং জলজ বাস্তুতন্ত্র। তোমরা এ পাঠে স্থলজ বাস্তুতন্ত্র এবং জলজ বাস্তুতন্ত্র সম্পর্কে জানবে।

#### স্থলজ বাস্তুতন্ত্র

এ ধরনের বাস্তুতন্ত্র আবার বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যেমন- বনভূমির বাস্তুতন্ত্র, মরুভূমির বাস্তুতন্ত্র ইত্যাদি। বনভূমির বাস্তুতন্ত্রের উদাহরণ হিসেবে আমরা বাংলাদেশের বনভূমি অঞ্চলের কথা বলতে পারি। বাংলাদেশের বনভূমি অঞ্চলকে প্রধান দুটি অঞ্চলে ভাগ করা হয়। (ক) সিলেট ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বনাঞ্চল এবং (খ) খুলনার সমুদ্র উপকূলবর্তী সুন্দরবন অঞ্চল। নিচে সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্র সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

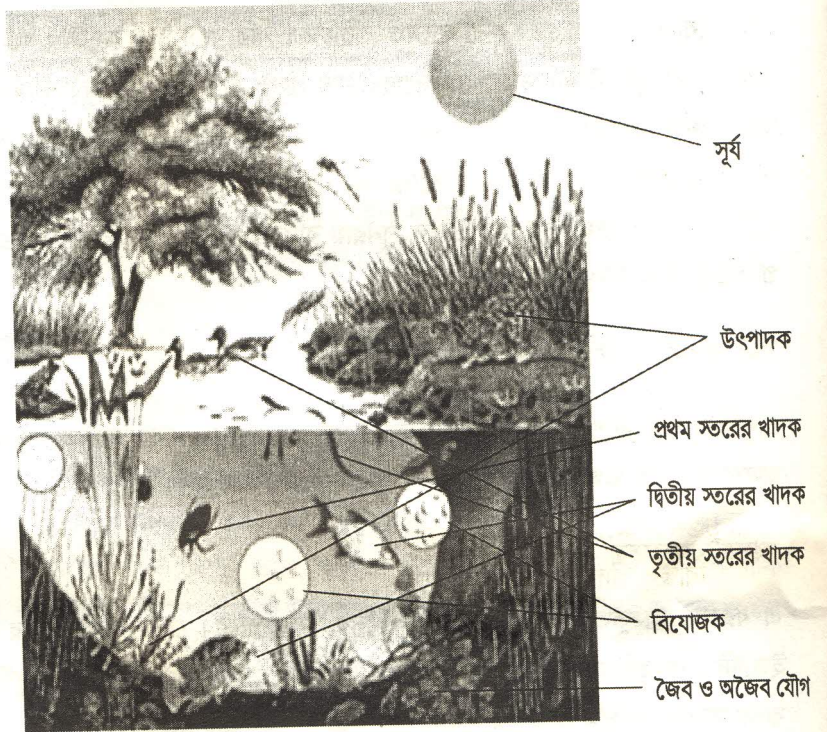
সুন্দরবনের বনভূমি অন্যান্য অঞ্চলের বনভূমি থেকে আলাদা বৈশিষ্ট্যের। খুলনা জেলার দক্ষিণে সমুদ্র উপকূল থেকে ভিতরের দিকে এ অঞ্চল বেশ কয়েক মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত। জোয়ার-ভাটার কারণে এ অঞ্চলের মাটির লবণাক্ততা বেশি, কাজেই লবণাক্ত পানি সহ্য করার ক্ষমতাসম্পন্ন উদ্ভিদই এ বনাঞ্চলে জন্মে। সুন্দরবনের বনাঞ্চল ম্যানগ্রোভ বন নামে পরিচিত। এ বনের মাটি বেশ কদমাক্ত। কাজেই এর ভিতর দিয়ে সহজে বাতাস চলাচল করতে পারে না। তাই এখানকার উদ্ভিদের মূল মাটির নিচে না গিয়ে খাড়াভাবে মাটির উপরে উঠে আসে। এসব মূলের আগায় অসংখ্য ছিদ্র থাকে। যার সাহায্যে উদ্ভিদ শ্বসনের জন্য বাতাস থেকে সরাসরি অক্সিজেন গ্রহণ করে। এ বনের উল্লেখযোগ্য উদ্ভিদ হলো সুন্দরী, গরান, গেওয়া, কেওড়া, গোলপাতা ইত্যাদি। এরা এ বনের উৎপাদক। পোকামাকড়, পাখি, মুরগি, হরিণ এ বনের প্রথম স্তরের খাদক। বানর, কচ্ছপ, সারস ইত্যাদি দ্বিতীয় স্তরের খাদক। এ বনের তৃতীয় স্তরের খাদকদের মধ্যে রয়েছে বাঘ, শূকর ইত্যাদি। এ সবের মধ্যে শূকর সর্বভুক। এ বনের উল্লেখযোগ্য প্রাণী রয়েল বেঙ্গাল টাইগার, চিতা বাঘ, বানর, চিত্রল হরিণ, বন্য শূকর, কুমির, নানা ধরনের সাপ, পাখি এবং কীটপতঙ্গ।



## জলজ বাস্তুতন্ত্র

জলজ বাস্তুতন্ত্র প্রধানত তিন ধরনের। যথা—

১. পুকুরের বাস্তুতন্ত্র
২. নদ-নদীর বাস্তুতন্ত্র
৩. সমুদ্রের বাস্তুতন্ত্র



চিত্র ১৪.১ : একটি পুকুরের বাস্তুতন্ত্র

তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে এখানে একটি পুকুরের বাস্তুতন্ত্র সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো। স্বাদু পানির একটি ছোট পুকুর জলজ বাস্তুসংস্থানের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ উদাহরণ। পুকুরে রয়েছে অজীব ও জীব উপাদান। অজীব উপাদানের মধ্যে পুকুরে রয়েছে পানি, দ্রবীভূত অক্সিজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং কিছু জৈব পদার্থ। এসব উপাদান জীব সরাসরি ব্যবহার করতে সক্ষম। জীব উপাদানের মধ্যে আছে উৎপাদক, প্রথম স্তরের খাদক, দ্বিতীয় স্তরের খাদক, তৃতীয় স্তরের খাদক ও নানা রকমের বিয়োজক। পুকুরের বাস্তুসংস্থানের উৎপাদক হচ্ছে নানা ধরনের ভাসমান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আণুবীক্ষণিক উদ্ভিদ যারা ফাইটোপ্লাঙ্কটন নামে পরিচিত। ভাসমান বড় উদ্ভিদের মধ্যে রয়েছে কচুরীপানা, শাপলা ইত্যাদি। ভাসমান ক্ষুদ্র উদ্ভিদ যেমন পুকুরের পানিতে রয়েছে তেমনি রয়েছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আণুবীক্ষণিক প্রাণী। এরা জু-প্লাঙ্কটন নামে পরিচিত। বিভিন্ন প্রকার জলজ কীটপতঙ্গ, ছোট মাছ, ঝিনুক, শামুক ইত্যাদি যারা উৎপাদকদের খায় তারা প্রথম স্তরের খাদক। আবার এদেরকে যারা খায় আরও একটু বড় মাছ, ব্যাঙ এরা দ্বিতীয় স্তরের খাদক। এদেরকে আবার যারা খায় যেমন কচ্ছপ, বক, সাপ এরা তৃতীয় স্তরের খাদক। পুকুরে মৃত জীবের উপর ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক বিয়োজকের কাজ করে। বিয়োজিত দ্রব্যাদি আবার পুকুরের উৎপাদক খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে।



## পাঠ ৬ ও ৭ : খাদ্য শৃঙ্খল ও খাদ্যজাল

তোমরা জেনেছ বাস্তুতন্ত্রে কোনো জীবই এককভাবে বেঁচে থাকতে পারে না। বেঁচে থাকার জন্য একে অন্যের উপর বিভিন্নভাবে নির্ভরশীল। জীবের বেঁচে থাকার জন্য তার চারপাশের সমস্ত উপাদান নানাভাবে প্রভাবান্বিত করে।

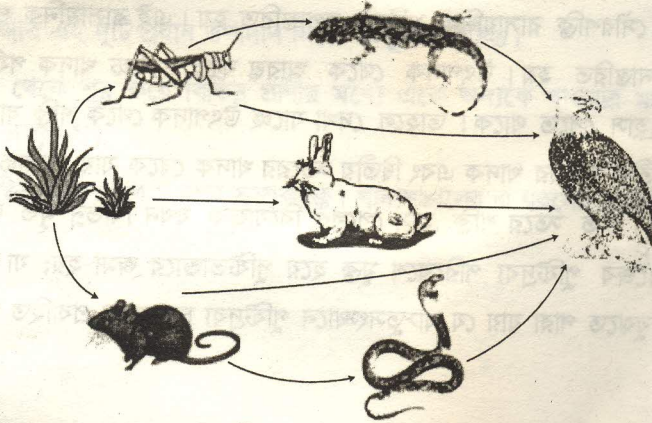
### খাদ্য শৃঙ্খল

এ পৃথিবীতে সকল শক্তির উৎস সূর্যের আলো। বাস্তুতন্ত্রের উৎপাদক হচ্ছে সবুজ উদ্ভিদ। তোমরা জেনেছ প্রাথমিক স্তরের খাদক খাদ্যের জন্য উৎপাদকের উপর নির্ভরশীল। আবার দ্বিতীয় স্তরের খাদক নির্ভরশীল প্রাথমিক স্তরের খাদকের উপর। তৃতীয় স্তরের খাদক খায় দ্বিতীয় স্তরের খাদকদেরকে। এভাবে একটি বাস্তুতন্ত্রে সকল জীব (উদ্ভিদ ও প্রাণী) পুষ্টি চাহিদার দিক থেকে ধারাবাহিকভাবে সংযুক্ত। ফলে গড়ে উঠে খাদ্যশৃঙ্খল। তাহলে দেখা যাচ্ছে উদ্ভিদ উৎস থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে একে অন্যকে খাওয়ার মাধ্যমে শক্তির যে স্থানান্তর ঘটে তাই খাদ্যশৃঙ্খল।

যেমন : ঘাস → পতঙ্গ → ব্যাঙ → সাপ → ঈগল।

### খাদ্যজাল

বাস্তুতন্ত্রে অসংখ্য খাদ্যশৃঙ্খল থাকে তা নিশ্চয়ই দেখেছ। এসব খাদ্যশৃঙ্খল কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। বরং বিভিন্ন খাদ্যশৃঙ্খল পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। খাদ্যশৃঙ্খলের এ ধরনের সংযুক্তিকে খাদ্যজাল বলা হয়।

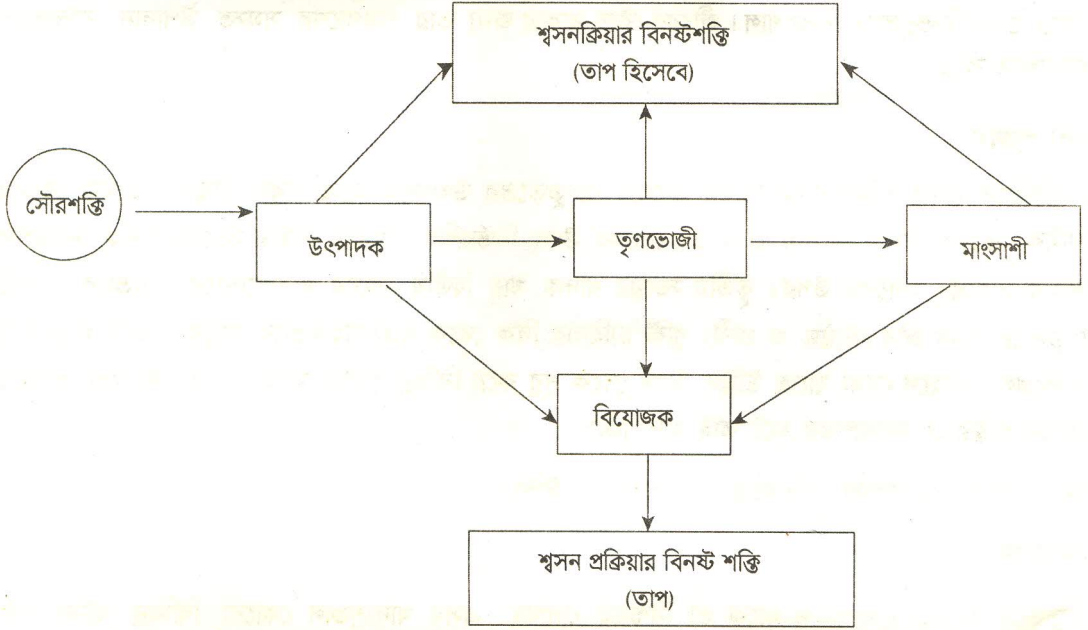


চিত্র ১৪.২ : খাদ্যজাল

## পাঠ ৮ ও ৯ : বাস্তুতন্ত্রে শক্তি প্রবাহ

তোমরা জেনেছ পৃথিবীতে বসবাসকারী সকল জীবই সূর্যের আলোর উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ জীবজগতের সকল শক্তির মূল উৎস সূর্য। সূর্যের যত আলো পৃথিবীতে আসে তার মাত্র শতকরা ২ ভাগ সবুজ উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে কাজে লাগিয়ে শর্করা জাতীয় খাদ্য তৈরি করে। সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় সৌরশক্তি রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। এ প্রক্রিয়া চলার সময় সবুজ উদ্ভিদ বিভিন্ন

ধরনের প্রাকৃতিক যৌগ, যেমন- পানি, নাইট্রোজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড, আয়রন, সালফার ইত্যাদি ব্যবহার করে। এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই জড় ও জীবজগতের মধ্যে সংযোগ সৃষ্টি হয়।



চিত্র ১৪.৩ : বাস্তুতন্ত্রে শক্তির একমুখী এবং পদার্থের চক্রাকার প্রবাহ

সবুজ উদ্ভিদের মাধ্যমেই সৌরশক্তি রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। এই রাসায়নিক শক্তি বিভিন্ন প্রাণীতে খাদ্যশৃঙ্খলের মাধ্যমে স্থানান্তরিত হয়। উৎপাদক থেকে আরম্ভ করে সর্বোচ্চ খাদক পর্যন্ত শক্তি রূপান্তরের সময় প্রতিটি ধাপে শক্তি হ্রাস পেতে থাকে। তাহলে দেখা যাচ্ছে উৎপাদক থেকে শক্তি যায় তৃণভোজী প্রাণীর দেহে। সেখান থেকে দ্বিতীয় স্তরের খাদক এবং দ্বিতীয় স্তরের খাদক থেকে যায় সর্বোচ্চ খাদকে। এভাবেই শক্তি প্রবাহ চলতে থাকে। প্রতি স্তরে শক্তি হ্রাস পেলেও বিযোজক যখন বিভিন্ন মৃত জীবে, বর্জ্য পদার্থে বিক্রিয়া ঘটায় তখন অজৈব পুষ্টিদ্রব্য পরিবেশে মুক্ত হয়ে পুষ্টিভাভারে জমা হয়; যা আবার সবুজ উদ্ভিদ কাজে লাগায়। এ থেকে বুঝতে পারা যায় যে বাস্তুসংস্থানে পুষ্টিদ্রব্য চক্রাকারে প্রবাহিত হয় এবং শক্তিপ্রবাহ একমুখী।

### পাঠ ১০ : পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বাস্তুতন্ত্রের ভূমিকা

পরিবেশে বাস্তুতন্ত্র একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ একক। যেকোনো পরিবেশে বাস্তুতন্ত্র মোটামুটিভাবে স্বনিয়ন্ত্রিত। প্রকৃতিতে যেকোনো জীবের সংখ্যা হঠাৎ করে বেশি বাড়তে পারে না। প্রতিটি জীব একে অন্যের উপর নির্ভরশীল। খাদ্য শৃঙ্খলের মাধ্যমে এরা পরস্পর পরস্পরের সাথে সম্পর্কযুক্ত। সহজে এর কোনো একটি অংশ একেবারে শেষ হতে পারে না। কোনো একটি পরিবেশে বিভিন্ন স্তরের জীব সম্প্রদায়ের সংখ্যার অনুপাত মোটামুটিভাবে অপরিবর্তিত থাকে। পরিবেশে বিভিন্ন পরিবর্তন ঘটলেও বহু দিন পর্যন্ত প্রাকৃতিক



ভারসাম্য বজায় থাকে। এসো একটি উদাহরণের সাহায্যে আমরা এ বিষয়টি বুঝতে চেষ্টা করি। মনে কর কোনো একটি বনে বাঘ, হরিণ, শূকর ইত্যাদি বাস করে। এ বনে বাঘের খাদ্য হলো হরিণ ও শূকর। হরিণ ও শূকরের সংখ্যা বেড়ে গেলে বাঘের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। কারণ বাঘ প্রচুর খাদ্য পাবে। আবার বাঘের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে হরিণ ও শূকরের সংখ্যা কমে যাবে। হরিণ ও শূকরের সংখ্যা কমে গেলে বাঘের খাদ্যাভাব দেখা দিবে। ফলে বাঘের সংখ্যাও কমে যাবে। আবার বাঘের সংখ্যা যদি কমে যায় তবে হরিণ ও শূকরের সংখ্যা বেড়ে যাবে। এভাবে হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে একটি এলাকার বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য প্রাকৃতিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়।

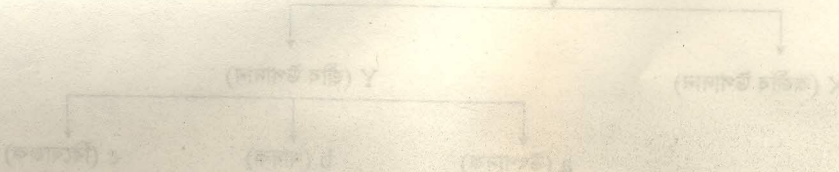
**কাজ :** পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বাস্তুতন্ত্রের ভূমিকা সম্পর্কে প্রতিবেদন তৈরি কর।

দল গঠন কর। যেকোনো একটি পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বাস্তুতন্ত্রের ভূমিকা সম্পর্কে প্রতিবেদন তৈরি করে শ্রেণিতে উপস্থাপন কর।

**নতুন শব্দ :** বাস্তুতন্ত্র, খাদ্যশৃঙ্খল, খাদ্যজাল, ফাইটোপ্লাঙ্কটন, জু-প্লাঙ্কটন

এ অধ্যায় পাঠ শেষে যা শিখলাম—

- যেকোনো একটি পরিবেশের জড় এবং জীব সম্প্রদায়ের মধ্যে আদান-প্রদান, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও সহযোগিতার মাধ্যমে গড়ে উঠে বাস্তুতন্ত্র।
- অজীব এবং জীব এই দুটি প্রধান উপাদান নিয়ে বাস্তুতন্ত্র গঠিত।
- উদ্ভিদ্ধ উৎস থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে একে অন্যকে খাওয়ার মাধ্যমে শক্তির যে স্থানান্তর ঘটে তাই খাদ্যশৃঙ্খল।
- প্রকৃতিতে বিভিন্ন খাদ্যশৃঙ্খল পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। খাদ্যশৃঙ্খলের এ ধরনের সংযুক্তি খাদ্যজাল নামে পরিচিত।



## শূন্যস্থান পূরণ কর

১. যে সমস্ত প্রাণী ————— তারা প্রথম স্তরের খাদক।
২. বাস্তুতন্ত্রের প্রাণহীন সব উপাদান ————— উপাদান নামে পরিচিত।
৩. প্রকৃতিতে জীব বিভিন্ন ————— মাধ্যমে একে অপরের সাথে সম্পর্কযুক্ত।
৪. প্রকৃতিতে অজীব ও জীব উপাদানের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হয়ে ————— সচল থাকে।

## সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. চিত্রসহকারে একটি পুকুরের বাস্তুতন্ত্র বর্ণনা কর।
২. প্রকৃতি কীভাবে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে আলোচনা কর।

## বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. নিচের কোনটি প্রথম স্তরের খাদক?

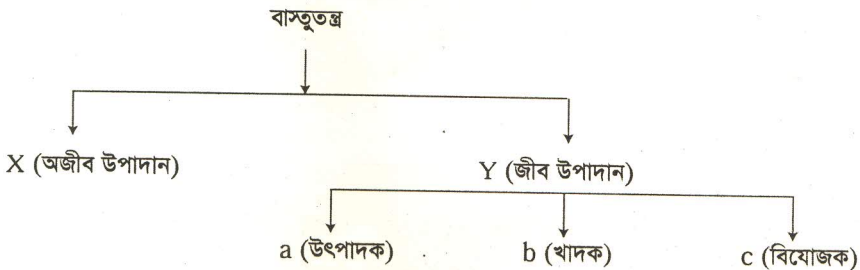
ক. ফাইটোপ্ল্যাংকটন  
গ. বাঘ

খ. শামুক  
ঘ. বক

২. নিচের কোন খাদ্যশৃঙ্খলটি সঠিক?

ক. ফাইটোপ্ল্যাংকটন → ছোট মাছ → জু-প্ল্যাংকটন  
খ. ফল → পতঙ্গ → পাখি  
গ. ঘাস → কচ্ছপ → ছোটমাছ  
ঘ. ক্ষুদিপানা → মাছ → শামুক

নিচের ছকটি লক্ষ কর এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও





৩. নিচের কোনটি c এর অন্তর্ভুক্ত?

ক. ফাইটোপ্ল্যাংকটন

খ. জু-প্ল্যাঙ্কটন

গ. ব্যাকটেরিয়া

ঘ. কীটপতঙ্গ

৪. উপরের ছকে-

i. X এর উপর Y নির্ভরশীল

ii. a এর উপর b নির্ভরশীল

iii. a ও c পরস্পর নির্ভরশীল

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

### সৃজনশীল প্রশ্ন

১. ফাহিম একটি বনে বেড়াতে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের গাছপালার মাঝে বিভিন্ন রকমের প্রাণীর উপস্থিতি লক্ষ্য করল। এদের মধ্যে ছিল খরগোশ, হরিণ, বানর, বাঘ, শূকর ইত্যাদি প্রাণী। সে খেয়াল করল বনের একটি অংশে বড় বড় গাছপালা কেটে ফেলা হয়েছে আর সে অংশে ঐ সকল প্রাণীর উপস্থিতি খুবই কম।

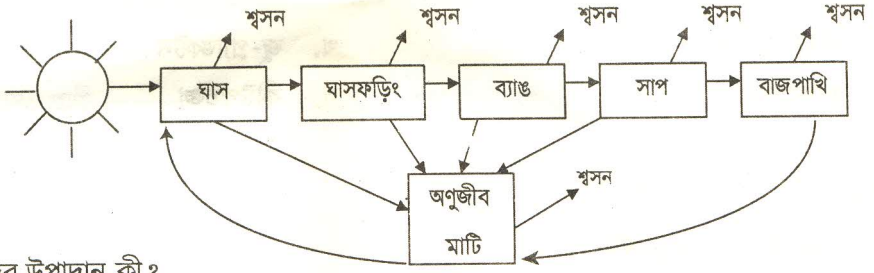
ক. বাস্তুতন্ত্র কী?

খ. বিয়োজক বলতে কী বোঝায়?

গ. ফাহিমের দেখা জীবগুলো দিয়ে একটি খাদ্যশৃঙ্খল তৈরি করে শৃঙ্খলটি ব্যাখ্যা কর।

ঘ. বড় বড় গাছপালা কেটে ফেলা অংশে প্রাণীর সংখ্যা কমে যাওয়ার কারণ বিশ্লেষণ কর।

২.



ক. জৈব উপাদান কী?

খ. খাদ্যজাল বলতে কী বোঝায়?

গ. উপরের শৃঙ্খলটিতে শক্তিপ্রবাহ কীভাবে চলে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্ভিদকে পুষ্টিপ্রবাহের চক্রটি কীরূপ হবে? বিশ্লেষণ কর।

প্রজেক্ট : পরিবেশের কয়েকটি খাদ্যশৃঙ্খল পর্যবেক্ষণ কর। পর্যবেক্ষণ শেষে এসব খাদ্যশৃঙ্খল ব্যবহার করে পোস্টার কাগজে খাদ্যজাল তৈরি কর এবং শ্রেণিতে প্রদর্শন কর।

সমাপ্ত